স্বপ্নালোকে প্রেতপুরী

শ্রী অবিনাশ চন্দ্র বিশ্বাস।

স্বপ্নালোকে প্রেতপুরী।

"জলান্তশ্চন্দ্রচপলং জীবিতং খলু দেহিনাং
তথাবিধমিতি জ্ঞাত্বা শশ্বৎ কল্যাণমাচরেৎ।"

ইতি কামন্দকীয় নীতিসারঃ।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বিশ্বাস
প্রণীত ও প্রকাশিত।

গুপ্তপ্রেশ
১২১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ;—কলিকাতা।

১৩০৪ ফাল্গুন।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

Calcutta:

Printed by A. K. Chakravarti

Gupta Press,

[illegible], Cornwallis Street

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার অন্নে

আমি বাল্যাবধি প্রতিপালিত

যাঁহার কৃপায়

আমি যে কিছু জ্ঞানলাভ করিয়াছি

আজ

সেই পরমগুরু পিতৃতুল্য পিতৃব্যদেব

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বিশ্বাস

মহোদয়ের

চরণ কমলে

আমার কল্পনার এই নবপ্রস্ফুট প্রসূন

ভক্তির সহিত

সমর্পণ করিলাম।

সেবকাধম

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র বিশ্বাস।

স্বপ্নালোকে প্রেতপুরী।

প্রথম দৃশ্য।

আঁধার পুরী।

এক অতি ভীষণ অন্ধকারপুরী। দারুণ দুর্ভেদ্য ঘুট ঘুটে অন্ধকার। কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অমাবস্যার নিশাও শতগুণে শ্রেয়ঃ। তাহাতে নীল নভোমণ্ডল আছে, আলোকময় উজ্জ্বল নক্ষত্ররাশি আছে, প্রহরে প্রহরে কলকণ্ঠ বিহঙ্গমের মধুর কূজন আছে, ঘরে ঘরে দীপমালার আলো আছে, অথবা অপরূপ ঘনাড়ম্বর আছে, হাস্যময়ী চপলার মনোমোহন হাসি আছে, বাত্যান্দোলিত পত্রপুঞ্জের মর্ম্মর ধ্বনি আছে।

সেখানে এর কিছুই নাই, অথচ আর যেন সব কি আছে। জীবিত যাহা দেখিতে পায় না, মৃত তাহা দেখিতে পায়;

জাগ্রতের যাহা অপ্রত্যক্ষ, নিদ্রিতের তাহা সহজ প্রত্যক্ষ। চৈতন্য যেখানে চলিতে সাহস করে না, স্বপ্ন সেখানে অনায়াসে চলিয়া ফিরে; সে স্থান এমনই ভয়ানক।

নিস্তব্ধ নিশীথে স্বপ্নের মোহালোকে হৃদয় কন্দর প্রোদ্ভাসিত হইল। অন্ধকারের পর অন্ধকার ভেদ করিয়া কেমন যেন এক অপূর্ব্ব অন্ধকারময় প্রদেশে প্রবেশ করিলাম। চতুর্দ্দিকে হাসির বৃষ্টি হইল। হাস্য অতি বিকট, বুঝিলাম মনুষ্য কণ্ঠের এ বিকট হাসি নয়। যাহারা হাসিতেছিল তাহাদের একজন বলিল "হেম, আমি তোমাকে চিনি।" আমি স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইলাম। ডাকটী এমনই সুন্দর, এমনই মধুর, তবুও কে ডাকিল, কে হাসিল, বুঝিলাম না। বিস্মৃতি মাথার উপর অন্ধকার পাড়িতেছিল। আগন্তুক আবার একই কণ্ঠে ডাকিল "ধর, হেম, ধর, এই পবিত্র জলে চক্ষু ধুইয়া ফেল।"

আমি আগন্তুকের পবিত্র বারিতে চক্ষু বিধৌত করিলাম।

নয়নে মধ্যাহ্ন তাপ অপেক্ষাও খরতর জ্যোতিঃ বিদ্ধ হইল, কিন্তু তবুও অন্ধকার। কিন্তু এ আলোক গৃহালোকে নাই, চন্দ্রে নাই, সূর্য্যে নাই। তাহাদের চেয়েও অনেক বৃহৎ, অনেক উজ্জ্বল। দেখিলাম ঊর্দ্ধভাগ হইতে এ আলো জ্বলিতেছিল। ঊর্দ্ধভাগের ও বহু উপরে, যাহাকে আমরা নীল নক্ষত্রমণ্ডল বলি, তাহারও উপরে, এক শুভ্রমণ্ডল দিঙ্মণ্ডল ব্যাপিয়া ধপ্‌ধপ্ করিতেছিল। কিন্তু চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক, আকাশে যেমন মেঘ, কুসুমে যেমন কীট, নির্ম্মল সলিলা ভাগীরথীতে যেমন কুম্ভীর, তেমনই এ উজ্জ্বল আলোকে গভীর কালিমা। আমাদের এ নীল চন্দ্রাতপে সূর্য্য জ্বলে, চন্দ্র হাসে, তারা ফুটে, কিন্তু এ

শূন্যমণ্ডলে ঘন কৃষ্ণবর্ণের এক একখানি প্রতিকৃতি অতি ভয়ানক। তাহাদের জ্যোতিঃ আকাশের শুভ্র জ্যোতিঃ ভেদ করিয়া যে স্থানে ফুটিয়াছিল, সে স্থান ঘোর তমসাচ্ছন্ন। অনতিদূরে সেই তমোময় প্রদেশে পুনরপি একই কণ্ঠ ধ্বনিত হইল "কেন, আমি আবার আসিলাম। চাহিয়া দেখি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ছায়ামূর্ত্তি অন্ধকারে মিশিয়া অতি মৃদু, অতি কোমল অথচ অতি বিকৃত কণ্ঠে ডাকিতেছে; অন্ধকারে মিশিয়া সে স্বর অধিকতর বিকট শুনা যাইতেছে। স্বাবস্থা না হইলে হয়তো ভয়ে মূর্চ্ছিত হইতাম। অপরিচিত কণ্ঠ আরো নিকটে আসিয়া বলিল "আমি তোমার বহুদিনের বন্ধু ললিত।" বন্ধু কথাটী বড়ই মিষ্ট, প্রাণ মন অকস্মাৎ নাচিয়া উঠে, বোধ হয় স্বয়ং দেবতা ভিন্ন এমন মধুর উল্লাসরব আর কেহ শুনাইতে পারে না। অলক্ষিতভাবে হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার হয়।

আমি সাহসে ভর করিয়া বলিলাম "ভাল করিয়া চিনিলাম না।"

বন্ধু। ভাল করিয়া কেন? একবারেই চিনিতে পার নাই। মনুষ্যের স্মৃতি বড় সঙ্কীর্ণ, বড় দুর্ব্বল, বড় চঞ্চল; আজ যাহা দেখিতে পায়, কাল তাহা ভুলিয়া যায়। নহিলে তুমি—যাহার সহিত এক পেট এক প্রাণ—হায় সে আজ কথাটাও বুঝিতে পারে না!!

আমি। কণ্ঠধ্বনিতে বোধ হয়, এমন একটী মধুর কণ্ঠ শুনিয়া থাকিব। কিন্তু আঁধারে মৃদুমধুর কণ্ঠও বিকৃতধ্বনিতে পরিপূরিত বোধ হইতেছে।

বন্ধু। আঁধার দেখিয়া ভয় কেন? যার আঁধার তার

আঁধার। এখানে আলোক আছে, তুমি আলোক থাকিতেও অন্ধকার দেখিতেছ।

আমি। আলোক থাকিতেও অন্ধকার দেখিতেছি, এ কেমন কথা?

বন্ধু। মনে কর তুমি অন্ধ, এখানে বেশ আলোক আছে, কিন্তু তুমি তোমার চক্ষের দোষে দেখিতেছ না।

আমি। এখানে তো আর আমি অন্ধ নই, বরং অন্ধকারপুরীতে দাঁড়াইয়া আছি।

বন্ধু। তুমি ভ্রান্ত, ভৌতিক চক্ষু মেলিয়া যত দিন চাহিয়া থাকিবে, ততদিন সব অন্ধকারময়।

আমি। অন্ধের তো চক্ষু নাই, সে কি আলো——

কথাটীও সম্পূর্ণ হইল না, অমনই চতুর্দ্দিকে প্রেতবৎ মূর্ত্তি সকল অন্ধকারের ছায়ায় মিশিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। যে স্থানে বায়ু নাই, সেই হাস্যধ্বনি মাথার উপর বায়ুবৎ সোঁ সোঁ শব্দে চলিতে লাগিল। প্রাণ দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। বহুকষ্টে কম্পিত পদদ্বয় ধরিয়া রাখিলাম। মুখে বাক্য ফুটিল না। অপরিচিত বন্ধু নির্ব্বাক চিত্তের ভীতি দর্শন করিলেন; প্রশান্তি রক্ষা করিয়া বলিলেন "যেম যাহা বলিলাম কিছুই বুঝিলে না; হাস্যই ইহার একমাত্র প্রত্যুত্তর।"

কে তাহার কথায় প্রত্যুত্তর করিয়া আবার অন্ধকারের সেই ভীতিবিহ্বলতাপূর্ণ বাক্য শুনিতে চায়। আমি নীরবে রহিলাম। বন্ধু তখন হাসিতে হাসিতে কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া পূর্ণচন্দ্রবৎ সুগোল ও ক্ষুদ্র এক আলোকপিণ্ড আমার সম্মুখে ধরিলেন। আলোক চন্দ্রালোকের ন্যায় স্বচ্ছ, নির্ম্মল

ও স্নিগ্ধ। কিন্তু এ জ্যোতিরালোক চন্দ্রালোকের ন্যায় ভুবনব্যাপী নয়; অথচ ইহাতে একজন পুরুষের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি বিভাসিত লক্ষিত হয়। আলোক নিস্তব্ধে আলোকধারীর সঙ্গে সঙ্গে মিটি মিটি হাসিতেছিল, বোধ হইল যেন ঘোর আঁধারে চপলা হাসিতেছে। কিন্তু চপলা চঞ্চলা, অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী। এ আলোসুন্দরী অতি মৃদুলগামিনী, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী নিশার ন্যায় খল খল হাসিনী, অথচ চতুষ্পার্শের তমোবস্ত্রাচ্ছাদনে ভীষরূপিণী। আলোকাভ্যন্তরে এক কুন্দ নবীন যৌবনকান্তি দীপ্যমান ছিল। মুখখানি প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের ন্যায়। সর্ব্বশরীরে যৌবনতরঙ্গ নাচিতেছিল। একবার চাহিয়া আর চাহিতে পারিলাম না। প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। মাথা নত ও মুখ অধোগামী করিয়া চক্ষু দুটী ঊর্দ্ধভাগে বিস্ফারিত রাখিয়া, নয়ন পাতা মিটি মিটি মেলিয়া, আবারও সেই প্রস্ফুটিত মুখপদ্মপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিলাম, এই না সেই চপল চক্ষু দুটী যৌবনভরে পদ্মপত্রের জলের ন্যায় টুলু টুলু করিতেছে, এই না সেই রক্তজবাবিনিন্দিত ওষ্ঠযুগল তাম্বুল চর্ব্বিত রাঙ্গা মুখের ন্যায় টুক্ টুক্ করিতেছে, এই না সেই ঘন অঞ্জনবৎ শ্মশ্রুরাজি মন্দ মন্দ সমীরণান্দোলিত কামিনী কেশগুচ্ছের ন্যায় উড়িতেছে, এই না সেই নাক, সেই কাণ, সেই মুখ, সেই চোক্, সেই সব। তখন আপনা আপনি মনে হইল, এই বুঝি আমার প্রাণের বন্ধু ললিত। আবার সন্দেহ হইল, ললিত তো জীবিত নাই। ললিতের কমনীয় বপুঃ মা শ্মশানঘাটে ভস্ম করিয়া আসিয়াছি। হায় যেদিন সেই তরুণ আলুথালু বেশ শ্মশানঘাটে ভস্ম করিয়া আসিলাম সেই দিন হইতে আর সেই

তুমি আমাকে ভালবাস, আমাকে দেখিলে সুখী হও বলিয়া আজ আমাকে দেখিলে। সত্যই কি প্রেম, তুই এখনও আমাকে দেখিলে সুখী হস্‌।

আমি। ভাই, তোকে পাইলে আমার খুব সুখ হয়, হৃদয়ের কপাট খুলিয়া যায়।

ললিত। তবে আসিস্‌ না?

আমি। এখানে যে অন্ধকার।

ললিত। এখানে আসিলে অন্ধকার থাকিবে না।

আমি। একাকী কিরূপে আসিব?

ললিত। তবে আর কাহাকে আনিতে চাও?

আমি। কেন? আমার মা, বাপ, ভাই, সকলই আমার সঙ্গে আসিবে।

ললিত। তাহারা পরস্পর পৃথক্‌ পৃথক্‌। আমি তো আসিয়াছি, আমার মা, বাপ তো কেহ আসিল না।

আমি। তাহাতে তুমি খুব দুঃখিত।

ললিত। আমি এককালে দুঃখিত ছিলাম। এখন আর দুঃখিত নই বরং সুখী, ভ্রান্তিক সুখের সুখ সুখ নয়, কালকালে যন্ত্রণাপ্রদ দুঃখ।

আমি। বল কি? পিতৃমাতৃ সুখের সুখ যন্ত্রণাপ্রদ?

ললিত। সকল সময়ের কথা বলি না। যখন জানি তাহাদিগের নিকট হইতে সুখ পাওয়া যাইতে পারে না, বরং প্রতি পদে তাহাদিগকে বিপদে ফেলাইবার কথা, তখন সেই অবস্থায় সুখকল্পনা বৃথা ও কষ্টকর।

ললিত এই বলিয়া যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষায় নিস্তব্ধে

চাহিয়া রহিল। সহসা দেখিলাম ললিতের স্থানে আর একটী ব্যক্তি আমার মুখের সামনে আলো আনিয়া বলিল "দেখ তো হেম, আমি কে?"

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দেখিলাম এ আমার বাল্যসখা সুরেন্দ্র, ঠিক সেইরূপ চেহারা, সেইরূপ রসিক।

বোধ হইল যেন সুরেনকে অনেক দিনের পর দেখিলাম। তখন আমিও সুরেনের সেই হাস্যময়ী মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম। "এই তো বুঝি আমার প্রাণের সুরেন?"

সুরেন হাসিল, ললিত হাসিল, তাহাদের হাসিতে আমি আরো হাসিলাম।

তখন সুরেন ও ললিত উভয়েই বলিল "চল, হেম, চল, এক নিভৃত স্থানে।" বলিতে বলিতে আলো লইয়া সম্মুখে ললিত ও পশ্চাতে সুরেন্দ্র আসিয়া আলোক বিনিন্দিত জ্যোৎস্নাময় পথে ভবে, উভয়ের মধ্যে করিয়া আমাকে লইয়া যাইতে লাগিল। পথিমধ্যে সুরেন বলিল "বলোত, হেম, আজ তুমি কোথায় গিয়াছ?"

আমি। কেন? তোমরা যেখানে, আমিও সেখানে।

সুরেন। না, তা না।

আমি। তবে কি?

এই বলিয়া আমি স্মৃতিদেবীর উপাসনা করিতে লাগিলাম, সেসময়ে উপাসকের উপাসনা ভঙ্গ করিয়া সুরেন বলিল "কেন? তোমার স্মরণ হয় না? ফাল্গুন মাসের দিবাভাগে এই হতভাগার জননী ঘোর উন্মাদিনীর ন্যায় কাঁদিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। তার নেত্রযুগল হইতে অবিশ্রান্ত জল ঝরিতে লাগিল। আত্মীয়

সুহৃদ হাহাকার রবে আকাশ ফাটাইলেন। সে রবে বসন্তের কোকিলকণ্ঠে গরল ঢালিল; বৃক্ষের পত্রপুঞ্জ মৃদু মৃদু মর্ম্মর ধ্বনিতে কাঁপিয়া উঠিল; মধ্যাহ্নাকাশে মেঘের ছায়া পড়িল। তরঙ্গিণীর স্রোত মালার কল কল ধ্বনি, হরিবোল রব ও স্বন্ স্বন্ শব্দ একত্রে মিশিয়া ভীমনাদে গগনমার্গ পরিপূরিত হইল। তুমিও ভাই, কাঁদিতে লাগিলে। কিন্তু কিছুতেই আমাকে দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। আমি যে স্থানে আসিবার, সে স্থানে আসিলাম। জানিও এ প্রাণপাখিটা মায়াস্নেহে দেহপিঞ্জরে যতদিন আবদ্ধ, ততদিন কেবল ছট্‌ ফট্‌ করে, উড়িলেই যেন রক্ষা পায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সংসার লীলা ও মায়ার খেলা।

আমি কিয়ৎকাল পর সুরেন ও ললিতের সহিত এক সৌধ মণ্ডিত সিংহদ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। অসংখ্য হীরা, মুক্তা, প্রবাল তাহার উপরিভাগে ধক্ ধক্ জ্বলিতেছিল।

সে স্থানে আবার চিত্রকরের অপূর্ব তুলি অপূর্ব রূপের সাজ গড়িয়া রাখিয়াছে। তাহার একস্থানে খল্ খল্ হাসিয়া গজেন্দ্র গামিনী গণেশ জননী মা পুত্র ক্রোড়ে লইয়া নানা ঢং করিতেছেন, অন্যস্থানে পুত্র বিয়োগোন্মাদিনী পুত্রশোকে নয়ন জলে বক্ষ প্লাবিত করিতেছেন।

এক স্থানে প্রণয়ী, প্রণয়িনীর রসের কথা, অন্য স্থানে বিয়োগ বিধুর, বিয়োগবিধুরার বিয়োগের প্রলাপ। এই দুই ভাবের অনেক ছবি সে স্থানে ছিল। কোনটীরই সর্বাঙ্গ সুন্দর ছিল না। তখন কে যেন আমার মধ্য হইতে বলিয়া উঠিল "এই বিবিধ বিচিত্র সাজ সজ্জাই ভগবানের কমনীয় সংসার লীলা।" আমি যেন বলিলাম, এই যে বিয়োগবিধুর ব্যক্তিরা কাঁদিতেছে, ইহাদের উপায় কি?

তখন সে আবার বলিল, ঐ দেখ, ইহাদের শোক অপনয়নের পক্ষে কেমন এক অপূর্ব্ব রূপ। উহার নাম মায়া।

আমি বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, সর্ব্বোপরি এক মহাপুরুষের বামহস্তে সর্ব্বগ্রাসিনী রাক্ষসী; দক্ষিণ হস্তে আবার সেই বিকটমূর্ত্তি কামকটাক্ষলোচনা অপরূপ রূপসী।

রূপসী বিয়োগিনীর দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। পুত্রবিয়োগোন্মাদিনী আবার তৎক্রোড়ে মুখ রাখিয়া, দিব্য শোক ভুলিয়া, সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে।

দ্বারদেশ অনেক উচ্চ, বোধ হইল যেন সর্পে সমুন্নতভাবে বিস্তৃত মুখব্যাদান করিয়া আছে। বোধ হইল যেন অন্ধকার ইহার নিশ্বাস। ইহার প্রতি নিশ্বাসে যেন অন্ধকার গড়াইয়া গড়াইয়া চতুর্দ্দিক ঘোর তমোময় করিয়া ছুটিয়াছে।

সেই ঘনান্ধকারে দেখিলাম প্রজ্বলিত অগ্নিদগ্ধ গভীর লোহিতবর্ণের এক লৌহ শলকা বহুদূর ব্যাপিয়া ঝল্ ঝল্ করিতেছে। শলকাধারী দূত এক ভীমাকার পুরুষ। আলোকে কেবল সেই ভীমমূর্ত্তির মুখখানি ফুটিয়া আছে। প্রথমদর্শনে ভয়ের বেগ উথলিয়া উঠিল। পরক্ষণেই জ্ঞানালোক প্রভায় ভয় তিরোহিত হইল।

দেখিলাম ভীমপুরুষের মস্তক গভীর কৃষ্ণবর্ণের, কিন্তু কুন্তলবিহীন। সুধারশ্মির অসিতরঙ্গের ন্যায় এক একটী কালো রেখা তাহাতে অঙ্কিত। তন্মধ্য হইতে অবিশ্রান্ত অগ্নি উদ্গীরণ হইতেছিল। ভাগ্যে অগ্নিকণা গাত্রে স্পর্শ করে নাই, অন্যথা প্রেতপুরীর কি হইয়া থাকিতাম কে বলিতে পারে?

তাহার ললাট বিস্তৃত ও ঠিক যেন মাংস-বিচ্ছিন্ন অস্থি খণ্ড।

নাসিকা এত স্থূল, এত অধোগত, যেন কপালের সহিত মিলিয়া এক কালো দাগ পড়িয়া আছে। চক্ষু আবার তেমনই সুগড়, কোটরাধিগত ও জবাফুলের ন্যায় রাঙা টুকটুকে। এমন রাঙা যে চাহিলে মুখ, চোক লাল হয়। চক্ষে পাতা, ভ্রূ নাই, যা মনুষ্যের চক্ষের কোন লক্ষণ নাই। এ বিকট মুখমণ্ডলে হাস্য নাই, ওষ্ঠ নাই, কেবল দন্তগুলি হস্তিদন্তের ন্যায় বৃহৎ।

সুরেনের দিকে দন্তগুলি বাহির করিয়া এক ভীষণ ভঙ্গিতে মস্তক দুলাইতে লাগিল। ভাবিলে এখনও ভয় হয়। সুরেনের দিকে মস্তক দুলাইতে দুলাইতে সেই প্রেতমূর্ত্তি অন্ধকারে ডুবিয়া পড়িল।

আমি সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এ কে?"

সুরেন্দ্র। এ আমাদের রাজার দূত, আমাদের বিস্তৃত পুরীর দ্বারপাল। উপরে যত মিষ্টিকথা জিনিস দেখিলে, সমস্তই ইহার মস্তকের লাঠিকথা। যৌবন ভরা অঙ্গ, প্রেম ফুটান মুখ, কটাক্ষ ভরা চাহনি, অধরের হাসি, সকলই ইহার গর্ভে কেবল জ্বলে! জ্বলে! জ্বলে!! জ্বলিয়া অঙ্গার হয়। উপরে তোমার মা, তোমার বাপ আছেন, তুমিও আছ। ইহারা সকলেই জ্বলিয়া অঙ্গার হইবেন, তুমিও হইবে।

আমি। মাথা নাড়িয়া ও তোমাকে কি বলিল?

সুরেন্দ্র। তোমাকে আমাদের মধ্যে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল এ কাহাকে লইয়া যাও? আমরা যাহা বলিলাম বোধ হয় শুনিয়াছ।

আমি। না, শুনি নাই। শুনিলেও বুঝি নাই।

সুরেন্দ্র। বলিলাম ইনি আমাদের যৌবনের বন্ধু। ইহার জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল, সম্প্রতি সুষুপ্ত। কর্ম্মেন্দ্রিয় বিকার রহিত দেখিয়া সুযোগ পাইয়া লইয়া আসিয়াছি। সময়মতে যথাস্থানে রাখিয়া আসিব।

তখন চক্ষু রক্তবর্ণ ও হস্তে দণ্ড সঞ্চালন করিয়া ভীমাকার প্রতিহারী উত্তর করিল "দূর হ পাপিষ্ঠেরা। এর শাস্তি কি জানিস ?"

ললিত নির্ভয়ে বলিল "কেন, মহারাজের হুকুম আছে।"

আবার বজ্রধ্বনির ন্যায় প্রত্যুত্তর হইল "কতটার ?"

ললিত পুনরায় বলিল "একশতটার।"

দূত। এ পর্য্যন্ত কতটা হইল ?

ললিত। একশতটা।

দূত। তবে আজ হইতে পূর্ণ হইল, মনে রাখিস্।

আমি। তার পর সুরেন্দ্র ?

সুরেন্দ্র। তারপর দূত বলিল "সাবধানে লইয়া যা, যেন চৈতন্য না পায়, চৈতন্য পাইলে, নিশ্চয় জানিস্, দণ্ডাঘাতে মস্তক চূর্ণ করিব।"

আমি। সে আবার কি ? আমি কি অচেতন ?

সুরেন্দ্র। তুমি একবারে অচেতন নও, সম্প্রতি নিদ্রিত।

বাক্যানুসারে সেই বিস্তৃত মন্দিরের এক অদ্ভুত স্থানে উপস্থিত হইলাম। ললিত বলিতে লাগিল "এই দেখ এক অপরূপ সিংহাসন, এই দেখ এক রূপবতী রমণী জগতের যাবতীয় রাজাভরণে ভূষিতা। এই দেখ মণি, মুক্তা, প্রবাল, হীরক প্রভৃতি যত কিছু উজ্জ্বল পদার্থ আছে, সকলই ইহার রাজ-মুকুটে চন্দ্রকিরণবৎ উদ্ভাসমান। আবও দেখ সিংহাসনেরই বা কি অপূর্ব্ব দ্যুতি। প্রকৃতিব জুই, গন্ধরাজ, মালতি যেন ইহার উপব ঠিক্ ঠিক্ ফুটিয়া আছে। আরও কত রকমের গাছপাতা কেমন উজ্জ্বলভাবে কে যেন ইহাতে দোলাইয়া রাখিয়াছে। বলতো ভাই, এ শোভার কোনটী নিন্দনীয়? কিন্তু পরিণামে আঁধারপুরীতে এ শোভা কে দেখে?"

আমি। ভাই, যথার্থ, শোভার দিকে চাহিলে আর চক্ষু ফিরে না। এ মহারাণী কে? ইহাঁর চক্ষু দুটি না মণি দুটী! মুখখানি না চাঁদ! মনে হয় সকল ত্যাগ করিয়া এইখানে পড়িয়া থাকি।

ললিত। অমন কথা মুখে আনিতে নাই। এর ষড়যন্ত্রে মানব অনন্তকাল নরকভোগ করে। যে কর্ম্ম ভুলিয়া এরদিকে চাহিয়া রহিল, সে চিরদিনের তরে সোণার শিকলে বন্দী হইল। ভাই, এই দুরাকাঙ্খিনী রাণীর নাম বাসনা। এর রাজ্যে পদার্পণ করা এক নরক বিশেষ। তোমাকে লইয়া নরকে আসিয়াছি।

আমি। কি বলিলে, ভাই, এমন মধুর রূপে এত কলঙ্কের ভরা।

ললিত। আপাতরম্য জিনিষ কিছুই মধুর নয়। আজ যাহা

সুন্দর দেখ, কাল তাহা ঢলিয়া পড়ে। যাহা সুন্দর, বাছিয়া লইতে পারিলে, তাহা সকল সময়েই সুন্দর। আগে নিজে সুন্দর হও, পরে পরকে সুন্দর দেখ। দেখতো, তোমার নিজ চক্ষে কত দোষ। তুমি কেবল সিংহাসনের রাণীর দিকে চাহিয়া আছ। নীচে কত কোটি কোটি লোক ইহার কৌশলে বাঁধা রহিয়াছে, সে দিকে তোমার একবার ভ্রূক্ষেপও নাই।

আমি। হাঁ ভাই, দেখিয়াছি। অসংখ্য লোক অসংখ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ। শৃঙ্খলগুলিই বা কেমন ঝকমক্‌ করে। সকলের পায়েই এক একটী শৃঙ্খল। সকলই জীর্ণ, শীর্ণ, যেন চৌদ্দবৎসর কাহারও নাড়ে ভাত নাই। ভাই ইহারা বাতুল না কি?

ললিত। ইহারা বাতুল হইতেও বাতুল। যতদিন ভোগের সংসার পাইয়াছিল, নিত্য নূতন জিনিষ সম্মুখে আসিয়া মন ভুলাইত। আজ ভাল বস্ত্র, কাল ভাল জুতা, আজ ভাই বন্ধু লইয়া সোহাগ, কাল তাহাদিগকে নানা রঙ্গের বস্ত্র দান, তোড়ায় তোড়ায় টাকা ঢালা, আর মজার সুখে খাওয়া। জীবনে দান, ধ্যান, সৎচিন্তা অনুশীলন ইহাদের ছিল না। কেবল অপকৃষ্ট সোনারূপা লইয়াই লোকের সঙ্গে কলহ করিয়া সময় কাটাইত। এদের ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিল ছিল না, লোকের সঙ্গে মিষ্ট কথা ছিল না। কেবল স্বোদর পূরণই একমাত্র

মহাব্রত ছিল। ভাই, দেখিতেছ, এখন কত দুর্দ্দশা।

আমি। এদের এ দুর্দ্দশা কে করিল?

ললিত। কে আর করিবে? নিজেরাই নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সকলই জানিবে আত্মকর্ম্মের ফলভোগ তোমাকে কে কি করিতে পারে, যদি তুমি ভাল হও ও সৎপথে তোমার মতি থাকে। আমাদের ধর্ম্ম-রাজের বিচার এই, যাহার যেমন কর্ম্ম তাহার তেমন প্রায়শ্চিত্ত।

আমি। ধর্ম্মরাজের বিচারেই কি ইহারা সকলে শিকল পরিয়া আছে?

ললিত। হাঁ, ধর্ম্মরাজ ভিন্ন আর পাপীর মঙ্গল বিচার এমন কে করিতে পারে?

আমি। ইহাদের প্রতি ধর্ম্মরাজের মঙ্গলবিচার কেমন, বুঝি-লাম না।

ললিত। বুঝিলে না? ধর্ম্মরাজের ইচ্ছা এই, যে বাসনার পোকা, তাহাকে বাসনাতে ডুবাইয়া রাখা, অনন্ত কোটি নরক ভোগ করাইয়া প্রলোভনের কুটিল ক্রোড় চিনাইয়া দেওয়া।

আমি। এই যে রুক্ষবেশী লোকগুলি দেখিতেছি এদের প্রতিও কি এই বিচার?

ললিত। সকলের উপরই এক বিচার, দেখতো ইহারা শিকল পরা ভিন্ন আর কোন শাস্তি কি বহন করিতেছে?

আমি। না, আর তো দেখি না। যে দিকে চাহিতেছি সেই দিকে শিকল ছাড়া আর কিছু দেখি না।

ললিত। তুমি বাসনার দাস, কেমন করিয়া সকল দেখিতে পাইবে? দেখতো ইহারা পৃষ্ঠদেশে কি দুর্ব্বহ ভার বহন করিতেছে।

আমি। হাঁ, দেখিয়াছি, ইহাদের প্রতিজনের পৃষ্ঠে এক একটী পাটের মলিন ছালা, কাহারো কাহারো পৃষ্ঠে সিন্দুকও দেখিতেছি। হায় কি কষ্ট। বেচারারা যেন ভারে নোয়াইয়া পড়িয়াছে। ভাই, এ ছালার মধ্যে কি? এরাই বা কার দণ্ডে এমন ভার বহন করিতেছে? ধর্ম্মরাজ কি পাপীর এইরূপ শাস্তি বিধান করেন?

ললিত। ছালাভরা কেবল ভুরি ভুরি মণি মাণিক্য। হতভাগারা স্বেচ্ছাক্রমে এই ভার বহন করিতেছে। বাসনাদেবীর ঈষৎ কৃপাকটাক্ষান্দোলনে ইহারা একেবারে উন্মত্ত। আপনা হইতেই ভার স্কন্ধে লইয়াছে। ধর্ম্মরাজ মনের মধ্যে ঢুকিয়া ঢুকিয়া কত বুঝাইলেন, কিছুতেই পোষ মানে নাই। ভার অসহ্য হইলে কাঁদিতেছে, তখন আবার বাসনাদেবী অঙ্গে হাত বুলাইতেছে। ইহার হস্তস্পর্শে যে অজ্ঞান, আবার সেই অজ্ঞানই। ভারে সকল শরীর থর্ থর্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চায়, চক্ষে দৃষ্টি নাই, মুখে বাক্য নাই, হৃদয়ে বল নাই তবুও দুর্ব্বুদ্ধির খেলায় বাসনাই ইহাদের ধন মান প্রাণ। ধর্ম্মরাজ ইহাদিগকে বলেন চিনির

বলদ, আপন ইচ্ছায় ভার ধরিয়াছে, আপন ইচ্ছায় পাপীরা মজিয়া যাইবে। আগে অনন্তকোটি নরক। তার পর দোষ বুঝিলে মুক্তি। ধর্ম্মরাজের এই বিচার।

আমি। এখানেই কি ইহারা ভারের চাপে গুড়া হয়?

ললিত। এখানে যে দেবী ইহাদিগকে স্বর্গে তুলেন, তিনিই আবার ভাবের চাপে দলিয়া মারেন। ভারের চাপে ইহাদের হাড় গুড়া হয়। সে গুড়া অসংখ্য অসংখ্য মণি মাণিক্যে মিলিয়া স্বর্ণ-ধূলিবৎ উড়িতে থাকে। উড়িয়া যার চক্ষে পড়ে সেও কাণা হয়।

আমি। এতেই কি ইহাদের মুক্তি?

ললিত। বল কি? পাপীর এত কম শাস্তি! ইহারা এখান হইতে মরিয়া আবার যম বিচারে একে একে নরকভোগ করে। তাহাতেও যদি বাসনা না মিটে, তবে আবার ঘুরিয়া আসিয়া এই বাসনার মন্দিরে ভার বহন করে। এইরূপ অনন্তকাল ঘুরিতে ঘুরিতে যখন দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিল, আর ধন, মানে, সাধ নাই, তখন জানিলে মুক্তি পাইল।

আমি। এইরূপ মুক্তি কতটী লোকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে?

ললিত। খুব কম লোকের ভাগ্যে। কলিযুগে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেও একটী কি না সন্দেহ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগের লোকেরাই ধন্য। মহাপুরুষেরা জীবনব্রত সাঙ্গ করিয়া অবাধে স্বর্গরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রহ্মের সহ এক হইয়াছেন। ব্রহ্মের গৌরব

সহ তাহাদের গৌরব পাতায় পাতায় মিশিয়া আছে, বিহগকুল প্রভাতে বিভুগুণগানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অক্ষয়-কীর্ত্তি ঘোষণা করে।

সে গানের রক্তিমচ্ছটায় সূর্য্য উঠে, ফুল ফোটে, আকাশে মেঘ দৌড়াইয়া চলে, তরঙ্গিনী স্ফীতবক্ষে মন্দ সমীরণ ভরে নৃত্য করে, শিশির ঝরে, প্রকৃতি হাসে।

ললিত। ভাই, সে গানের মাহাত্ম্য মদোন্মত্ত কলির প্রাণী কি বুঝিবে? আমি সংসার ছাড়িয়াছি, কিন্তু এখনও সে শোভিত অপরূপ রূপ হৃদয়ে জাগে। জানিও ভাই, সংসার পুণ্যপ্রতিষ্ঠাতার যশোমন্দির। কুক্ষণে কলির জীব হইয়া জন্মিয়াছিলাম, জীবনেও আশার কুসুম ধরিয়া ধরিয়া ফুটাইতাম, মৃত্যুতেও সেই আকাঙ্ক্ষা লইয়া নরকগামী হইতে আসিয়াছি।

আমি। ভাই ললিত, দুঃখ করিও না। তোমার জীবনে পাপের প্রসূন ফুটিতে দেখি নাই, তুমি যৌবনের প্রথম সময় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছ, একরূপ ভালই হইয়াছে। সংসারে আর কিছুদিন থাকিলে কত কুটিল ক্রোড় আশ্রয় করিতে হইত কে বলিতে পারে।

চতুর্থ দৃশ্য।

অসতী রমণীর পাপের ফল।

ললিত আমার কথায় এক দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মৎসমভিব্যাহারে মন্দিরের অপর ভাগে প্রবেশ করিল। অকস্মাৎ চক্ষু অধোগামী হইল, অকস্মাৎ নয়নমণি দুটী পলকবিহীন নেত্রদ্বয়ে টলমল করিতে লাগিল। একঘোর তুফান বহিয়া বহিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ঢালিতে লাগিল।

দমগুণবিরহিতা তরঙ্গিনী আবার পবনালিঙ্গনে মত্ত হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিল। নাবিকের প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। রক্তিমাভা মুখ ফেরিল। দেখিলাম কবিবর বিদ্যাপতি তখন ঢেউয়ে ঢেউয়ে গাহিতে গাহিতে চলিলেন——

কিয়ে মম দিঠি পড়ল শশিবয়না।
নিমখি নেহারি রহল দুহুঁ নয়না॥
দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর।
কাল হয়ে কিয়ে উপজিল মোর॥
মানস রহলো পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহলো মনোভব জাগি॥

শ্রবণ রহলো কঁচে শুনাইতে রবে।
চলাইতে চাহি চলনে নাহি যাবে॥

তখন আবার ললিত আমার মনের সহিত এক হইয়া গাহিতে লাগিল —

ছুঁও না এমনা হেথা, সরমে নামায়ে মাথা,
অনঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গে বাঁকায়ে নয়ন পাতা,
মাখায়ে বিষের জ্বালা, অধরে প্রেমের খেলা,
প্রতি অঙ্গে বিভাসিছে ভালবাসা মধুরতা।

আমি। বাঃ, গানটীতো ঠিক সময়ে গাহিয়াছ।

ললিত আবার মনের উল্লাসে গাহিতে লাগিল——

অঙ্গভরা যৌবনরঙ্গ, ঠিক যেন নদীতরঙ্গ,
প্রেমের বায়ে রূপের ঢেউয়ে,
করে কত রঙ্গের খেলা।

নীল আকাশে চাঁদের হাসি, সমল সলিলে ভাসি,
উজল বিমল আভা, না জানি কতই শোভা,
মলয় মারুত সনে তরঙ্গে তরঙ্গে মিশি।

আমি। গানটীর ভাব তো বড় মধুর। তাই আবার গাও।

তখন ললিত ললিতকণ্ঠ বাজাইয়া আবার গাহিতে লাগিল —

রমণী প্রেম রতন, পুরুষ অদয় মন,
মদনে আঁধলে আঁখি দেখে না দেখে না তাহা।
গোলক ভুলহ লেহ রমণী রমণে যাহা॥

প্রকৃতি রমণী বেশে, ফুলে ফলে সদা হাসে,
নদীতে তরঙ্গ বহে, সেওতো রমণী বেশে,
জননী, ভগিনী, নারী, পুরুষে বুঝিবে কি তা?

ললিত গাহিতে গাহিতে বলিল "এখানকার শোভা ভাল করিয়া দেখ।"

আমি। ছি! এখানে যে বিলোল কটাক্ষলোচনা কামিনী!

ললিত। কেন কামিনী কি ফেল্‌বার যায়? কামিনীতে জগৎ-সংসারের সৃষ্টি, কামিনীতে সংসারের জয়শ্রী প্রতিষ্ঠিত, কামিনীতে পুরুষের প্রণয়বন্ধন, কামিনীতে স্নেহের অপূর্ব্ব ক্ষমতা, ভালবাসা, সরলতা ও বিনয় স্বভাব। ঋষিরা কামিনীরূপে দেবতার ধ্যান করিয়াছেন। তাই, কামিনী সংসারের মহৎ জিনিষ।

আমি। সকলই কি একরকমের কামিনী? এরাও কি এই রকমের কামিনী?

ললিত। না, এদের স্বভাব অসৎ। ইহারা কুটিলা গতি ধরিয়া বাসনা দেবীর দাসী। কিন্তু তুমি ধার্ম্মিক হইলে তোমার মতে সকলই এক হওয়া উচিত। যাঁহারা সাধু তাঁহারা বলেন সদসৎ একই জিনিষ। সুখ, দুঃখ একই জিনিষ। তাঁহাদের মতে সকলই একমেব-দ্বিতীয়ম্। দেখ সাধকের জগৎ পবিত্র। মনে দুরাকাঙ্ক্ষা নাই। তাঁহারা যাহা দেখেন সকলই ব্রহ্মের ন্যায় পবিত্র। কুটিলা নারীও তাহাদের চক্ষে সরলা।

আমি। দুর্বৃত্তা নারী দেখিলে স্বতঃই আমার ক্রোধ হয়। আপনা হইতেই মনে ঘৃণা জন্মে।

ললিত। তোমার মহাভ্রম। মহাপুরুষেরা বলেন পাপকে ঘৃণা করিও কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না। কথাটী

বলিল। পাপকে নির্জ্জন করিয়া দূরে পারিবে না। কিন্তু পাপীতে তোমার কোন অধিকার নাই? পাপী ঈশ্বরের জীব, ঈশ্বর তাহার দণ্ডবিধান করেন।

আর প্রত্যক্ষই দেখিতেছ সদা পাতিব্রত্যা নারীগুলা বিধাতার বিধানে এখন কেমন ঘোর দণ্ড বহন করিতেছে।

বামনা দেবী পুরুষকে যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন, রমণী-কেও সেই শৃঙ্খল পরাইয়া রাখিয়াছেন।

পুরুষ রমণী এক শৃঙ্খল আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু জীবনে যেমন পরস্পর স্বেচ্ছাচার করিতে পারিত, এখন তাহা পারে না। শুধু ভোগেচ্ছা মাত্রই যমদণ্ডের ঘোরতর আঘাতে মূর্চ্ছিত হয়।

ভাই হে, এখন দেখ যুবতী বামাদিগ নবীন যৌবনতরঙ্গের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে পুষ্পবৎ উৎফুল্ল। কাহারো অলকদাম কালো কুচ-কুচে ও মেঘমালার ন্যায় চাঁদবদন ঢাকিয়া আছে, রূপের মুখখানি তবুও এক একবার কেশগুচ্ছের আন্দোলন সঙ্গে সঙ্গে কমল ফুলের ন্যায় ফুটিয়া সৌরভে দিগন্তর আমোদিত করিতেছে। কাহারো সুরভিতৈলমার্জ্জিত, মুক্তাশোভিত কুন্তলে বেণী কপিনী সপিনী কৌশলে মস্তকের ভার বিমণ্ডিত। কাহারো আলুলায়িত কেশ বিজয়পতাকার ন্যায় উড্ডীয়মান। সকলেরই ললাটভাগ সুন্দর, নির্ম্মল ও প্রসন্ন সৌরকরবৎ উজ্জ্বল। কিন্তু উদয়োন্মুখ হিমাংশুমালীর ন্যায় রক্তিমদ্যুতি দীপ্যমান সিন্দুর-বিন্দু বিহীনে সুন্দরতাশূন্য। নাসিকা কাহারও উন্নত কাহারও অধোগত। ভ্রূযুগল অনঙ্গ সৌন্দর্য্য প্রেমোন্মাদক ও অতি কমনীয় দীপ্তি ব্যঞ্জক, কিন্তু অবিশ্রান্ত বরিষার বারিধারার ন্যায়

জলধারাপ্লুত। বদন কমল শোভায় শরদিন্দুবিনিন্দিত কিন্তু অধরে পূর্ব্ববৎ লুহু লুহু হাসি নাই, কুহু কুহু বচন মাধুরী নাই। ভাই হে মুখ চোক লোকের ভাবের মধুর লাবণ্য। যে মুখে হাসি নাই, বা যে চক্ষে তুল বিভা নাই, আমি বলি তেমন মুখ চোক না থাকাই ভাল।

আমি। ভাই সত্য কথা। বড়ই ভীষণ সন্তাপ। একটি রমণী, সকলই যৌবনোৎফুল্ল কান্তি, সে কান্তিতে হাসি নাই বা মুখে বাক্য নাই। এরা সুন্দরী হইলে কি হয়? গুণ সুন্দর না হ'লে কি রূপ সুন্দর দেখা যায়? মুখে হাসি থাকিলে কুৎসিত লোকও সুন্দর দেখায়।

ললিত। ভাই, ইহাদের আরো ভীষণ কষ্ট। ইহারা কামবাণে প্রপীড়িতা, বিরহানলে দহ্যমানা। ইহাদিগকে পুরু-ষের ধারে দাঁড়াইয়া চক্ষু নত করিয়া থাকিতে হয়। যদি কোন সময় পুরুষের পানে ইহাদের চপল চক্ষু বিক্ষিপ্ত হয়, তবে অকস্মাৎ ভীমাকার দণ্ডধারী দূত, রক্ত চক্ষু, ঢুলু ঢুলু করিয়া ঘোর দণ্ডের প্রয়োগে ইহা-দের পৃষ্ঠদেশের মাংস বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু তবুও এই নির্লজ্জা চপল-স্বভাবা দুশ্চারিণী রমণীকুল পুরুষের পানে না চাহিয়া থাকিতে পারে না। অবিরত প্রহার জ্বালায় কাঁদিয়া আকুল। ভাই, পাপীর জ্বালা অধিক ক্ষণ দেখিতে হয় না। চল অন্য এক স্থানে যাই।

এই বলিয়া ললিত আমাকে সঙ্গে করিয়া যাইতে লাগিত চলিল।—

(ওগো) পাপিনি, তাপিনি দুঃখিনি রমণি,
শান্তিদায়িনী, গোলক বিহারিণী মা বলে
ডাক্ গো এখন।
ত্রিতাপ হারিণী, অথ্য সনাতনী
ভকত বৎসলা, কলুষ নাশিনী জননীরে
ডাকিস্ গো যদি তোরা হৃদয় খুলে কেঁদে
ঘুচিবে এ তাপ জুড়াবে পরাণ ॥
ব'লে রাম নাম, যা স্বরগ ধাম
ডাকিয়া মোক্ষদায়িনী বৈকুণ্ঠবাসিনীরে,
গেলে পুণ্যধাম, রহিবে না কাম
পশুপক্ষী চরাচরে ডাক্‌বে হরে হরে ॥

গাহিতে গাহিতে ললিতের চক্ষে জল আসিল। সেই কাঁদার স্বরে অকস্মাৎ সুরেনের কণ্ঠ আসিয়া মিলিল। আমি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম সুরেন সম্মুখে গাহিতেছে।——

ব'লে রাম নাম, যা স্বরগ ধাম,
ডাকিয়া মোক্ষদায়িনী বৈকুণ্ঠ বাসিনীরে,
গেলে পুণ্যধাম, রহিবে না কাম,
পশুপক্ষী চরাচরে ডাকবে হরে হরে ॥

পঞ্চম দৃশ্য।

নরক।

সুরেন গাহিতে গাহিতে বলিল "ভাই হেম, আমরা অধম। আমাদের আবার বৈকুণ্ঠ কি? চল আমাদের সঙ্গে চল, নরকাগারে চল। পাপাচারী লোকের দশা তোমাকে দেখাইব, যেন আর পাপে মজিতে না হয়।"

যাইতে যাইতে সম্মুখে দেখিলাম এক ঘোরদর্শন পুরুষ, সর্ব্বাঙ্গ ভুজঙ্গ গরল দুষ্ট মৃত বপুর ন্যায় ভয়ানক কালো।

সেই কালো রঙ্গের উপর অবিশ্রান্ত রুধিরের স্রোত বহিতেছিল। লোচনদ্বয় ব্যাঘ্রলোচন অপেক্ষাও ভীষণতর। ভয়ানক মূর্ত্তি! ক্ষণকাল তাকাইলে ভয় হয়। আমি চমকিয়া উঠিলাম। ভয়ানক মূর্ত্তি আমার দিকে চাহিয়া রোষে বজ্রনাদ করিয়া বলিল "কিরে এত বড় আস্পর্দ্ধা?" মুহূর্ত্ত মধ্যে সুরেন স্বর্ণবিনির্ম্মিত এক গোলাকার পদার্থ উদ্ঘাটন করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে দস্যু কোথায় লুকাইল, দেখিলাম না।

কিয়দ্দূর গমনান্তর আবার আর একটী মূর্ত্তি নাচিতে নাচিতে সম্মুখে দেখা দিল। কপালে অগ্নি বর্ণের দুইটী চক্ষুর মত চড়াইতে চড়াইতে এক মহা আর্ত্তনাদ করিতেছিল।

সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ ও নরকঙ্কালাবৃত। মুখ দিয়া অনর্গল রুধির ঝরিতেছিল। তাহার পর আর একটী মূর্ত্তি দন্তে দন্তে ঘর্ষণে এক একবার অগ্নি জ্বালিতেছিল আবার নিবাইতেছিল।

শরীরে মাংস নাই, কেবল ধবল অস্থিপুঞ্জ। একটীর পর একটী, তার পর আর একটী, এইরূপে অনন্তের পর অনন্তশ্রেণী নিমেষ মধ্যে উড়িয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপে অগণিত প্রেত শ্রেণীর মধ্য দিয়া এক নিস্তব্ধ অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিলাম। সেখানে এক দেবমূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছিল। তাহার অগ্নিময় তাপে কক্ষের সর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়াছিল। তাহার রূপ অতি প্রখর, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড তাপের ন্যায়। শরীরে রামধনুর ন্যায় বহুবর্ণ ভাসিতে-ছিল। কখন লোহিত, কখন কালো, কখন হরিত। সকল রঙ্গে এক হইয়া এক জ্যোতিঃ ফুটিয়াছিল, সে জ্যোতিঃ শুভ্র কামিনী কুসুম তুল্য শ্বেত।

হস্ত অনন্তকোটি, অনন্ত কোটি হস্তে অনন্ত শাণিত তরবার। তরবার শ্রেণী কিরণে ঝক্ মক্ করিতেছিল।

মস্তকে যাবতীয় শ্মশান ভূমির প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা। কপাল ও চক্ষু জ্বলন্তালোকমালায় সমাচ্ছন্ন। দন্ত বিকট ও শূকরের ন্যায় তীক্ষ্ণ। লোল জিহ্বা, আকৃতি গম্ভীর, বদনে হাসি নাই। বক্ষস্থল প্রশান্ত ও তদুপরি এক স্পষ্ট রক্তাক্ত ত্রিশূলচিহ্ন উদ্ভাসিত।

আমি সুরেনের মুখে শুনিলাম এই শেষোক্ত পুরুষই পিশাচদিগের রাজা।

সুরেন সেই প্রদেশের এক স্থানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিল "হেম, কি দেখ?"

আমি বিস্মিত হইয়া দেখিলাম এক অন্ধকার গহ্বর। গহ্বরটী আমি এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। বোধ হইল যেন সুরেনের কথায় সঙ্গে সঙ্গে গহ্বরটীরও সৃষ্টি হইল।

সুরেন আমাকে বিস্মিত দেখিয়া বলিল "হেম কি দেখ?"

আমি। দেখিতেছি, এক বিশাল অন্ধকূপ।

সুরেন। এ স্থান হইতে ভাল দেখা যায় না, সম্মুখে চল।

এই বলিয়া সুরেন ক্রমে ক্রমে পিশাচ রাজের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি বলিলাম "এ দিকে কেন? গহ্বর তো নিকটে দেখা যায়।

সুরেন্দ্র। তোমার ভ্রম। গহ্বর এ স্থান হইতে অনেক দূরে। নদীর ঘাট হইতেও গ্রাম দেখা যায়, কিন্তু নদী ঘুরিয়া গ্রামে পৌছিতে কত সময় লাগে?

সুরেন পিশাচ রাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া করপুটে যেন কি নিবেদন করিল। উভয়ে উভয়কে কি কথা বলিল, তাহারাই জানে। কিন্তু ক্ষণকাল পরে আমি দেখিলাম দস্যু আর তথায় নাই। কেবল তাহার শরীরের জলন্ত তাপ ছিল। সে তাপে গহ্বরের অনেক দূর আলোকিত হইতেছিল। গহ্বর বহু যোজন বিস্তৃত, অতলস্পর্শ ও ঠিক যেন পাতাল গামী। গহ্বর

রেছে। তার পর আবার আর কয়েকজন আসিয়া কতকটীর মাংস কামড়ে কামড়ে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া, টানিয়া টানিয়া খাই-তেছে আর বিকট ভঙ্গিতে নাচিতেছে।

এর মধ্যে যাহারা বলবান তাহারা হুড় মুড় করিয়া কাহারও গলা টিপিয়া মুখ চোক লাল করাইয়া মারিয়া ফেলাইতেছে, হস্ত প্রবেশ করাইয়া কাহার চক্ষের মণি দুটি টিপিয়া গালিতেছে, কাহার গণ্ডে কর প্রবেশ করাইয়া মুখ চিরিয়া দিতেছে।

পরস্পরের মৃতদেহের জন্য আবার বলবানে বলবানে ঘোর কলহ বাঁধিতেছে।

কলহে কেহ কাহার গাল ছিঁড়িয়া খাইতেছে, কেহ কাহার বুক চিরিয়া রুধিরে মুখ ভরাইয়া ভীষণ ভঙ্গিতে মুখ নাড়িতেছে। সকলই এইরূপ ইতর জন্তু অপেক্ষাও ভয়ানক। আমি সুরেনের দিকে চাহিয়া বলিলাম "ইহারা ইতর জন্তু।"

সুরেন। শুধু ইতর জন্তু কেন? একবারে বন্যপশু। কিছুকাল পরে দেখিবে ইহাদের আর নরাকৃতি নাই। হিংস্র ব্যাঘ্র, ভল্লুকরূপে ভূতলে, নরলোকের অরি হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লুপ্ত হইলে মনুষ্যও পশুতে পরিণত হয়।

সুরেন্দ্র আবার গহ্বরের আর এক ভাগে যাইয়া বলিল "দেখ, এই দেখ, আর এক পাপের স্থান।"

আমি পূর্ব্ববৎ পূর্ণবিস্ময়ে দেখিলাম এক পার্শ্বে যুবক পুরুষ-গণ মন্দ মন্দ শ্মশ্রুবিরাজিত বামগণ্ড বাম করতলে সংন্যস্ত করিয়া কোন সাক্ষাৎ ঘোর বিপদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। চক্ষু দেখিলে বোধ হয় যেন জল ঝরে ঝরে ঝরে না। মুখ একবারে

ওষ্ঠ ও বিকৃতাবস্থ নাসাটি দেহ হইতে টপ্‌ টপ্‌ খসিয়া পড়িতেছিল। অপর পার্শ্বে যুবতী বামাদন করতলে গণ্ড ন্যস্ত করিয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান ছিল— যেন অচিরেই কোন দুঃসহ কার্য্যের প্রতীক্ষায় নৈরাশ্য সাগরে ডুবিতে যাইতেছিল— যেন প্রকৃতি অচিরেই প্রলয় আশঙ্কা করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতেছিল।

যুবক যুবতীর মধ্যভাগে এক ঘন কৃষ্ণবর্ণের ভীম পুরুষ অগ্নিদণ্ড দোলাইতেছিল। সে মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রমণীকুল অবিরত বারিবর্ষণ করিতেছিল, যেন রাহু ভয়ে শশী আকাশ হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শিশির ঢালিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে সেই ভীম পুরুষ অকস্মাৎ প্রজ্বলিত অগ্নিময় লৌহদণ্ড যুবক ও রমণীর মুখের ভিতর প্রবেশ করাইল। অমনি এক ভীষণ ধ্বনি করিয়া তাহারা বিচেতন হইল।

সুরেন্দ্র এই পুরুষ এবং রমণীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "এই যে
পুরুষগুলি দেখিলে, উহারা জীবনে কেবল রমণীদিগকে
প্রলোভিত করিবার আকাঙ্ক্ষায় ঘুরিয়া ফিরিত;
আর ঐ রমণীগণও সর্ব্বদা পুরুষের পানে চাহিয়া
চাহিয়া সুখের পাখা উড়াইয়া উড়াইয়া চলিত।"

গহ্বরের এই ভাগ ছাড়িয়া কিয়দ্দূর গমনান্তর দেখিলাম এক একটী নারীসহ এক একজন পুরুষকে বাঁধিয়া ভীমাকার দণ্ডধারী দূত ঘোরতর প্রকারে উভয়ের সংজ্ঞা বিলুপ্ত করিয়া দিতেছে। সংজ্ঞা লুপ্ত হইলে তাহাদের চৈতন্য করার্থ চক্ষে শূল বিধাইতেছে। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ক্রন্দন করিলে আবার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে, অবশেষে জ্বালা অসহ্য হইলে শকৃন্মূত্র ত্যাগ করিতেছে। তথাপি আঘাতদানে বিরত না হইয়া সেই

মলমূত্রে পুনঃ পুনঃ তাহাদের মস্তক ঘাঁতিয়া ঘাঁতিয়া ধরিতেছে। মলমূত্রগুলি মুখের চতুর্দ্দিক ছড়াইয়া ছড়াইয়া কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত সংস্পৃষ্ট হইয়াছে। এক বিষম ঘৃণিত কাণ্ড।

সুরেন বলিল "ভাই, দেখ কি, এই এক একটী রমণী পুরুষের প্রলোভনে মত্ত হইয়া, সংসারের নির্ম্মল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দুরাকাঙ্ক্ষার নিম্নস্রোতে গমন করিত। তাহার শাস্তি এই। এই যে বৃহৎ গহ্বরটী দেখিতেছ, ইহার প্রতিপার্শ্বে এক এক নরককুণ্ড। এক এক পাপের এক এক নরক। এইরূপ পাপের সংখ্যাও অনন্ত, নরকের সংখ্যাও অনন্ত।"

ষষ্ঠ দৃশ্য।

যমরাজের বিচার।

আমি বলিলাম "আর। নরকের হীন কীর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে চাই না। দুর্গন্ধে আমার নাক পুড়িয়া গেল।"

"তবে চল' এই বলিয়া সুরেন উচ্চকণ্ঠে বাজাইতে বাজাইতে চলিল।——

জ্বলিছে ঝলিছে কিরীটিক ভাতি।
ক্ষরিছে অরুণ প্রবল চক্ষু দ্যুতি।।
তাহে মিলিছে কালো কুন্তল রাজি।
ভাগে নিখিল রূপ কাজরে মাজি।।
জ্বলিছে ললাটে প্রলয় অগনি।
গিরীশ ভালে যথা মহা বহনি।।
রক্তিম আঁখিনী ঢুলু ঢুলু ঢলে।
প্রাতর ভানু জিনিয়া ভীম জ্বলে।।

নিশাস চৌদিকে ঘোরবে দহে।
অনল ঝড় যেন কল্পান্তে বহে।।
বদন জৃম্ভন অতি ভীম রূপ।
যৈছন বিশ্ব রক্ত অন্ধ কূপ।।
চিবুকে বহিছে শোণিত তরঙ্গ।
লোহিত আগিতে মিলি ভীম অঙ্গ।।
বদনে শোভে করাল দন্তিদাঁত।
সরব জীব কঙ্কাল ইথে পাঁত।।
রাজিছে শ্মশ্রু ঘন কালো বরণ।
করিছে যেন শত অহি ধারণ।।
ঝুলিছে কণ্ঠে জীব কঙ্কাল মালা।
সাজিছে অঙ্গের সাজ ঝলমলা।।
ধরিছে দণ্ডধর অগ্নিম দণ্ড।
ফুকারছে অগ্নি ফুক্ ফুক্ চণ্ড।।
স্বরগ মরত পাতাল ব্যাপিয়া।
বসিছে যম পাপজীব গিলিয়া।।
নাচিছে পিশাচ ভৈরব হুঙ্কারে।
কাঁদিছে পরাণীদল হরে হরে।।

আমি। ভাই, তোমাদের রাজার কি এমন ভয়ানক মূর্ত্তি!

সুরেন্দ্র। রাজা তোমার পক্ষে আপাততঃ ভয়ঙ্কর। কিন্তু সাধকের চক্ষে এ মূর্ত্তি অতি প্রশান্ত। তাহারা এ মূর্ত্তির উপাসক। এখন তুমি প্রায় রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়াছ। রাজার সম্মুখে যাইতে নাই। এই স্থান হইতে সব দেখিতে পাইবে। আমি যমের

কণ্ঠে ভীষণ অস্থিমালা। হস্তে এক উত্তোলিত আম দণ্ড। আকাশ, পাতাল জুড়িয়া অনন্ত সিংহাসন। উভপার্শ্বে ভূত প্রেতেরা বিকট ভঙ্গিমায় ধপ্ ধপ্ নাচে। ভাই, তোমার বর্ণনা হাড়ে হাড়ে মিলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কিরীটোপরি যে হুতাশনসম প্রদীপ্ত লৌহ মণ্ডিত এক ত্রিশূল দিগ-ব্যাপিয়া আলোক বিকীর্ণ করিতেছে, এ বিষয় তুমি কিছু উল্লেখ কর নাই।

সুরেন। ভাই ত্রিশূলরাজকে প্রণাম কর। উনি শক্তিমান, ভাবময়, দেবদেব মহাদেবের ত্রিশূল। আমি পাপী; ইহার অনন্তালোক লক্ষ্য করি নাই।

আমি ভক্তিভাবে করপুটে ত্রিশূলরাজকে দণ্ডবৎ করিয়া মাইকেলের সরল লালিত্য মাখা কবিতা মনে মনে বলিতে লাগিলাম।—

"দেহছে ত্রিশূল মম মাথায় সুন্দরি,
তমোময় যমদেশে, অগ্নিস্তম্ভসম,
জ্বলি উজলিবে দেশ, পুজিবে ইহারে
প্রেতকুল, রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।"

(মেঘনাদ বধ কাব্য, দ্বিতীয় ভাগ)

তারপর সুরেন্দ্র বলিল "হেম, প্রেতপুরীর মহারাজকে প্রণাম কর। ইনি পাপীর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করেন।" আমি পূর্ব্ববৎ প্রণত হইয়া রাজাকে প্রণাম করিলাম। এমন সময়ে অকস্মাৎ দেখি কালো মূর্ত্তি বিস্ফারিত, পূর্ব্বের অভ্রমণ্ডল হইতে, দুইটী ভীমাকার চিত্র যমসিংহাসনদ্বার সমীপে উপস্থিত হইল।

তাহাদের কান্তি ঘোর কৃষ্ণবর্ণের। যম কিরীটিলোকও তাহা-
দের শরীরের মধ্যে অন্ধকারে পরিণত হইয়াছিল। তাহাদের
শরীর সুদীর্ঘ। তাহারা মুক্তকেশী, জীর্ণ, শীর্ণ ও আকাশ পাতাল
স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। একজনেরও মুখ চোখ কিছুই
ছিল না, কেবল মস্তকের নাসিকার স্থানে আচ্ছাদিত সেইখানে
একটী সুরঙ্গ ছিল এবং সেই সুরঙ্গ দ্বারা শব্দ করিতেছিল।
অপর জনের শুধু ললাট ছিল। ললাটে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ চক্ষু
ধক্ ধক্ জ্বলিতেছিল। তাহার নাসিকা বা তৎপার্শ্ববর্তি কোন
অঙ্গ ছিল না, কেবল মস্তক হইতে গলকণ্ঠ পর্য্যন্ত এক গভীর
সুড়ঙ্গ গহ্বর ছিল।

তাহাদের পানে চাহিতে না চাহিতেই সুরেন্দ্র বলিল "এই
দুটী ভীম মূর্ত্তির মাঝারে পৃথিবীর সকল অমঙ্গল দুঃখ ব্যাধি
বিদ্যমান।"
সুরেন্দ্র আবার আর একদিকে চাহিয়া বলিল "ঐ দেখ এক
অদ্ভুত কাণ্ড।"

আমি এবারও অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখিলাম, গগনকুণ্ডলে যে সকল
অসংখ্য জ্যোতি ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় বিচরণ করিতেছিল, তাহারা
এইক্ষণে রাজ্যাভিমুখে পতিত হইতে আরম্ভ করিল, যেন বিশ্বব্যাপী
চিরুনীর চালনায় অসংখ্য উকুন ঝরিতে লাগিল। আমিও
তাহাদের মত একটী উকুনের ন্যায় পৃথ্বীর কয়েক পদ বাহিরে
দাঁড়াইয়া ছিলাম। কিন্তু দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যাহারা
এতক্ষণ যমকেশে বিচেতন, মলিন ও হতশ্রী হইয়া অবস্থান
করিতেছিল, তাহারা এইক্ষণ নক্ষত্ররূপে রাজপুরী আলোকিত
করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া মন পুলকিত হইল, কারণ প্রেত-

পুরীতে কেবল তাহাদের অঙ্গেই মনুষ্য অঙ্গের সকল শোভা বিরাজিত ছিল।

এক একজন ভূতপ্রেত তাহাদের মুখের সম্মুখে ফুং ফুং আগুন জ্বালাইয়া নাচিতেছিল।

আমি এই অদ্ভুত জীবলীলা দর্শনে যমরাজকে সাধুবাদ দান করিব, এমন সময়ে কৃতান্ত কুণ্ডল হইতে জীব পতন মাত্রই মহাদেবের ত্রিশূল বাজিতে লাগিল।

চণ্ডমূর্ত্তি যম এই জীবদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রে পামর! তোদের কিছু স্মরণ হয়?" যমের এই গর্জ্জন সিংহ গর্জ্জন অপেক্ষাও ঘোরতর রবে পুরী বিকম্পিত করিল।

জীবগণ নির্ব্বাক ও কম্পিত কলেবর। যম তখন পূর্ব্ববৎ রোষভরে বলিলেন,"যাও দূত, ইহাদিগকে স্মৃতিমন্দিরে দ্বাদশ বৎসর রাখিয়া আস। এই দ্বাদশ বৎসর মধ্যে ইহারা পূর্ব্বকথা স্মরণ করিবার জন্য যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারিবে ও আত্মীয় সুহৃদের সহিত ভূলোকের নিদ্রিত অবস্থায় স্বেচ্ছাক্রমে আলাপ করিতে পারিবে। এইরূপ সাক্ষাৎলাভাধিকারী লোকের সংখ্যা যেন এক শতটীর অধিক না হয় এবং অপর প্রেত সকল যেন ইহাদিগকে বাধা না দেয় এই জন্য আমার সনন্দপত্র স্বরূপ এক একটী স্বর্ণ গোলক দান কর।

(আমি দেখিলাম যে গোল পদার্থ দ্বারা সুরেন্দ্র আমার সহিত আগমন কালে প্রেতদিগকে নিবারণ করিয়াছিল, এ গোলকও তাহাই)।

আমি সুরেন্দ্রকে এই সব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে না করিতেই সে বলিল "ভাই, এই জীবগণ প্রেতপুরীতে প্রথম আগমন

করিল। সমুদ্রমন্থন হইয়াছিল, মহেশ আজ পাপীদিগকে কুণ্ড হইতে মুক্ত করিয়া যমের বিচারে আবদ্ধ করিবেন। যম যদি কোন মহাপাপের বিচার করা। যা যাতে পুণ্যাবাপ্তি না হইলে বিচার অসম্ভব। তদিবানে পাপীদিগের অগ্নিমন্দিরে দ্বাদশ বৎসর অবস্থান করিতে হয়। অগ্নিতে সম্যক্ শুদ্ধ হইয়া যখন আত্মায় আলোক আসে, তখন জানিবে মুক্তি, নচেৎ নরক। তাই, বিধাতা পাপীদিগকে না দেখিয়া সহজে নরকগামী করেন না।

সুরেশের কথার সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে এক মধুর ধ্বনি হইল।——

জয় দেব শিব শঙ্কর।
শঙ্কর এ পাপ অসুর॥

সুরেশ বলিল "ইনি সাধু পুরুষ, ইঁহাকে প্রণাম কর।"

সাধু প্রেতরাজের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন "দেও নিষ্কৃতি দেও, আমি কৈলাস ধামে যাইব।"

যম। কৈলাসে যাইতে সরলতা চাই, প্রেম চাই, আকাঙ্ক্ষার নির্ব্বাণ চাই। তুমি সরলতা কি শিখিয়াছ? আত্মপাপ মুক্তকণ্ঠে বলিতে পার?

সাধুর প্রতি কথাগুলি বলিবার কালে যমের মূর্ত্তিতে প্রশান্তির চিহ্ন লক্ষিত হইল।

সাধু। যাহা করিয়াছি মুক্তকণ্ঠে বলি, শুন। একদিন গিরি-গহ্বরে ধ্যান মগ্নচিত্তে আসীন ছিলাম, এমন সময়ে সম্মুখে চাহিয়া দেখি এক বিকচ নলিনী-রূপিণী শোভনা রমণী গিরিগুহা আলোকিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অকস্মাৎ মনো মাঝারে পাপবিজলী ঝলসিয়া

উঠিল। রমণীলাবণ্য বড় শক্ত প্রলোভন। আমার ধ্যানভঙ্গ হইল। তখন কলিযুগের প্রারম্ভ। হায় সেই কলির প্রারম্ভাবধি কত অনুতাপে পুড়িয়া মরিলাম। হায় সেই পাপে তোমার প্রেতপুরীতে আসিলাম। ইদানীং স্মৃতিমন্দিরে দ্বাদশ বৎসর অশ্রুবিসর্জন করিয়া চৈতন্যোদয় হইয়াছে। আর এখানে থাকিব না। দেও, ত্রিশূল দেও।

যম। তোমাকে পরীক্ষা করিব।

এই বলিয়া প্রেতরাজ মায়াবলে মহাপুরুষের সমক্ষে অপ্সরা বিনিন্দিত রমণী রূপমাধুরী ভাসাইতে লাগিলেন, নিজে নানারূপ বিকট ভঙ্গিতে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। ত্রিশূল লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "এখানে যে অগ্নি! ইহা কিরূপে ধরিবে?"

সাধু পুরুষ নির্ভীক হৃদয়ে বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া যম কিরীটোপরি ত্রিশূল ধারণ করিয়া কৈলাস ধামে গমন করিলেন।

তখন যমের করাল বদনে ধ্বনি হইল "সাধু, সাধু"। প্রেতগণ শব্দ করিতে লাগিল "সাধু, সাধু"। সে রবে সকল পুরী আকম্পিত হইয়া বলিল "সাধু, সাধু"। সকল শঙ্খ আবার ত্রিশূলে বাজিয়া উত্তর করিল "সাধু, সাধু।" সাধু পুরুষের গমনান্তর দেখিলাম কলিযুগের অনেক রাজা দণ্ডায়মান। যম আক্ষেপ করিয়া বলিলেন "কি ঘোর কলি! তোমরাই আবার লোকের শাসনভার লইয়াছিলে?"

রাজা। মহারাজ, আমাদের তো অনেক পুণ্য কর্ম্ম আছে।

যম ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন "আছে অনেক পুণ্যকর্ম্ম। মারা-

প্রেতাগণ। যা, নরককুণ্ডের মলমূত্র তোদের আবাসস্থান হউক। তোরা অবিরত দূতগণের প্রহার সহ্য কর্‌।"

তাহারপর দেখিলাম যমদ্বারে একজন পুরুষের রজ্জুবদ্ধ হস্তে আগমন।

যম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "রে অবোধ, পর্ব্বের পাপ মনে পড়ে?"

পুরুষ লজ্জিতভাবে উত্তর করিল "মনে পড়ে। মাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছি, কেহ জানে না।"

যম। কেন মারিলে? মারিয়াই বা লোক সমক্ষে কি বলিলে?

পুরুষ। সর্ব্বদা অনেক দুশ্চারিণী রমণী লইয়া ব্যসনাসক্ত থাকিতাম, মা নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার পীড়ার সময় বিষ আনিয়া খাওয়াইয়া দিয়াছি। মা আমার মুখপানে চাহিয়া বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন। আমার পাপ প্রাণও সে যাতনায় কাঁদিয়া উঠিল। পরে লোকগোচরে প্রকাশ করিলাম ব্যাধিতে মাতার মৃত্যু হইয়াছে।

যম দন্ত কিড়িমিড়ি করিয়া বলিলেন "তোকে আর অধিক কি কহিব? তুই মাতৃহন্তারক, পিশাচ প্রকৃতি, যা, নরকে গিয়ে মলমূত্র বহন কর্‌।"

এইরূপে লোকের পর লোক, বিচারের পর বিচার, দণ্ডের পর দণ্ড দেখিতেছি, এমন সময়ে সুরেন্দ্র বিকটধ্বনি করিয়া অন্তরীক্ষে উড়িয়া গেল। মনে এমন ভয় হইল যে চীৎকার দিব দিব এমন সময়ে কে যেন বলিল "হেম, ভয় কেন? সুরেনের আজ বিচারের দিন।"

আমি ফিরিয়া দেখি পশ্চাতে ললিত। ললিত বলিল "কেবল পাপের অনন্ত দেশা, অনন্ত দণ্ড, অনন্ত নরক। কত দেখিবে? ধর্ম্মের সরল বিশ্বাসে মন না রাখা এক নরক, রমণী প্রলোভন এক নরক, অর্থলোভে মজিয়া সৎকার্য্যের বিসর্জ্জন এক নরক, পুত্র পত্নীতে মত্ততা এক নরক, তাহাদিগকে না ভালবাসা এক এক নরক, পিতা মাতা ও আত্মীয় জনে অভক্তি এক নরক, পরোক্ষে বা সম্মুখে নিন্দা করা এক নরক, অপবাদের কারণ থাকিলেও অপবাদে মন রাখা এক নরক, লোকের সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহারের সহিত অন্তরে অন্তরে না মিশা এক নরক, পরশ্রী কাতরতা এক নরক, কটুভাষিত্ব ও মিথ্যাকথা এক নরক, দীন-জনে উপেক্ষা এক নরক, লোকের সঙ্গে কলহ এক নরক, মানুষে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া এক নরক, নিজকে নিজে ঘৃণা করা এক নরক, নিজের প্রকৃত সুখ না জানা এক নরক,—অধিক কি, কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ষড়রিপু হইতে যতটী অসৎ স্পৃহা জন্মে তাহার প্রত্যেকটী নরক।"

এইসারগর্ভ কথাগুলিতে ভয় দূরে গেল। জিজ্ঞাসা করি-লাম "ভাই হে সাধু তবে কি প্রকারে হওয়া যায়?" ললিত কিছুকাল ভাবিয়া বলিল "বিশ্বজনীন ভালবাসায় যাহার চিত্ত যত প্রশান্ত, তিনি তত সাধু।"

সপ্তম দৃশ্য।

স্মৃতি মন্দির ও আত্মার অবিনশ্বরত্ব বিষয়ক সংলাপ।

ললিত এই বলিতে বলিতে যে দিকে চলিতে লাগিল, আমিও সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে প্রথমে যে অন্ধকারময় প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলাম, সেই প্রদেশেই আবার গিয়ে উপস্থিত হইলাম।

সে দেশে পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকার নাচিয়া নাচিয়া ঢেউ খেলিতেছিল, পূর্ব্বের ন্যায় শুভ্রবর্ণ আকাশে কালো বীভৎসমূর্ত্তি সকল ভাসিতেছিল। পূর্ব্বের ন্যায় কালোমূর্ত্তির কালো জ্যোতিতে অন্ধকারে এক রঙ্গ ফুটিয়াছিল, সে রঙ্গ যুবতীর নিবিড় কৃষ্ণ কেশদামে নাই, নিরদমালাবৃত অন্ধময়ী অমানিশার নিশায় নাই। সকলই পূর্ব্বের ন্যায় কিন্তু অন্তঃকরণ আর পূর্ব্বের ন্যায় নহে, অনেক প্রফুল্ল, অনেক উজ্জ্বল, অনেক প্রশান্ত।

প্রলোকে আত্মীয় বান্ধবের সাক্ষাৎ লাভ করে। পাপস্মৃতিতে চৈতন্যোদয় হইলে মোক্ষলাভ হয়না। আবার অনন্ত নরক।

জ্ঞানালোকের প্রভাবে আমি ললিতকে বলিলাম "ভাই, তুমি প্রেতপুরীতে নবাগত। কাঁদিবার জন্য হয়তো তোমারও এক নির্জ্জন প্রদেশ আছে।"

ললিত। আমারও এক নির্জ্জন স্থান আছে। কিন্তু কাঁদিয়া আমি প্রফুল্ল হইয়াছি আর কাঁদিব না।

আমি। তবে ভগবান করুন, অবাধে তুমি স্বর্গরাজ্য আশ্রয় কর।

ললিত। বলিব কিরূপে? আমরা কলির জীব। বিচারে কি হয়, কে বলিবে?

আমি। তুমি জীবনের অনেক কথা আমাকে বলিয়াছ। আমি জানি, তুমি কলিতে জন্মিয়াও পুণ্যবান্।

ললিত। পরিহাসচ্ছলে অনেক দিন অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছি ও রমণী কটাক্ষ মধুর বোধ হইয়াছে। এজন্য অনেক অংশ বিসর্জ্জন করিয়াছি। এখন চল, আমার বাসস্থানে যাই। সে স্থানে যাইয়া দুজনে আলাপ করিব।

আমি ললিতের সঙ্গে তাহার উপবেশন মন্দিরে অশ্বত্থ গাছের তলে উপবেশন করিলাম। গাছটী দেখিতে খুব সুন্দর ডালে ডালে, পাতায় পাতায় মেশামেশি করিয়া একবারে ইহাকে ব্যাপিয়া ধরিয়াছিল, ডালগুলি মাটীর দিকে নোয়াইয়া পড়িয়াছিল।

মধ্যে মধ্যে আবার দুই একটী ডাল বাঁকা হইয়া উপরের

দিক ঘটিয়াছিল। শরীরের বল হইতে দেখিতে গেলে বোধ হয় ঠিক যেন একটা জোর আছে।

অনেক জাতীয় পাখী তথায় বাস করিত কিন্তু কোলাহল করিতেছিল না। বৃক্ষের গোড়া না মোটা ও ক্রমেই উপরের দিকে সরু, ডাল পালার আয়তন। নিবিড়ভাবে ঘেরা ছিল, যেন একখানি চাঁদোয়ার কাপড়। আমরা বৃক্ষের সেই সুশীতল ছায়ায় বসিয়া দুই জনে কথা কহিতেছিলাম।

আমি। ভাই ললিত, এ গাছের ছায়া বড় ঠাণ্ডা, যেন প্রাণও শীতল করে।

ললিত। যতদিন আমি এখানে বসিয়া থাকিতাম তখন বোধ হইত যেন গাছটিতেও অমিয় আছে। নিজের মন পোড়া থাকিলে, শীতল জিনিস আরো পোড়া হইয়া যায়।

আমি। ভাই, তুমি যে আমাকে এখানে আনিয়াছ, তোমার তো কোন অপকার হইবে না?

ললিত। কি অপকার হেম?

আমি। তোমাদের নিয়ম একাকী এস্থানে থাকিতে হয়।

ললিত। সে জন্য ভাবিও না। তুমি এখানে আসিতে পার, আমার কোন অপকার হইবে না। কারণ তোমাতে আমাতে অনেক প্রভেদ।

আমি। কিরূপ প্রভেদ বুঝিলাম না।

তখন ললিত জ্ঞানালোক শিখা বাড়াইয়া বলিল "ভাই, তুমি জান যে এখানে স্বর্গের মধ্যে আসিয়াছ?"

আমি জ্ঞানালোকের কমনীয় জ্যোতির দিকে চাহিয়া

বাংলায় "জানি।"

ললিত। তোমার মন পৃথিবীর সুখ চায়, আমি অবাধে তাহা ত্যাগ করিয়াছি। এখন বিভিন্নতা বুঝিলে?

আমি। বুঝিয়াছি, তবুও সংশয় মিটে না।

ললিত। কেন, সংশয় কি?

আমি। ভাই, তোমরা সকলই মৃত, তবে তোমাদের দেহ দেখিতেছি কিরূপে?

ললিত। তুমিও এখন নিদ্রিত, তবে তোমার দেহ দেখিতেছি কিরূপে? তোমার চক্ষুও ত মুদ্রিত আছে, তুমিই বা আমাকে দেখিতেছ কিরূপে?

আমি। স্বপ্নে বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য্যসকল বিলুপ্ত হওয়াতে মনশ্চক্ষুদ্বারা তোমাকে দেখিতেছি।

ললিত। এতদূর বুঝিতে পারিলে, অবশ্যই বুঝিবে বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত হৃদয়, আত্মা, মনের সম্বন্ধ ভিন্ন প্রকারের।

আমি। ভিন্ন প্রকারের স্বীকার করি। কিন্তু মৃতের সহিত তদ্বিষয়ক কোন সম্বন্ধ আছে কি না সন্দেহ।

ললিত। বল কি? আচ্ছা অগ্রে বল দেখি তোমার দেহের সহিত তোমার আত্মার কোন্ সম্বন্ধে আমার সহিত কথা বলিতেছ?

আমি। আমার আত্মা স্বপ্নের মধ্যে দেহ সহ বিজড়িত বলিয়া স্বপ্নালোকে সেই আত্মার প্রভাবে তোমাকে দেখিতেছি। কিন্তু তোমরা যখন দেহ ত্যাগ করিয়াছ, তখন তোমার আত্মাও দেহের সঙ্গে লয় পাইয়াছে। সুতরাং আবার কিরূপে তোমার দেহ দেখিতেছি।

ললিত। তোমার কথায় সুখী হইলাম। তুমি বুঝিতে পারিয়াছ আত্মার বলে আবার আর একটী দেহ গঠিত হয়। কিন্তু তোমার বিশ্বাস সাধারণ লোকের ন্যায়। তুমি মনে কর শরীর সহ আত্মার একত্র সম্মিলন ও সেই শরীর ধ্বংসেই আত্মার ধ্বংস। এ বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। এ বিশ্বাস বলে লোকের মৃত্যুতে ভয় নাই। তাহারা মনে করে মৃত্যু হইলেই সুবিধা সকল ফুরাইল। পাপের পর নরক আছে, যদি সংসারের লোক জানিত, তবে সংসারের অবস্থা এতদিন অনেক ভাল হইয়া দাঁড়াইত।

আমি। তবে তুমি দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কিরূপ বল?

ললিত। যাহা না থাকিলে তুমি থাক না, না তোমার দেহের সত্তা থাকে না, তাহার নাম আত্মা। ধান্যের সহিত তণ্ডুলের যে সম্বন্ধ, দেহের সহিত আত্মার সেই সম্বন্ধ। ধান্য হইতে তুষ বহির্গত হইলে যেরূপ তণ্ডুল নির্গমন হয়, দেহ হইতে নিত্য ক্রিয়াসাধক কতকগুলি যন্ত্রা-দির অপলোপ হইলে সেইরূপ আত্মানামক এক মহা-পদার্থের নিষ্ক্রমণ হয়। জীবেরা তণ্ডুলের জন্য যেমন ধান্যের আদর করে, মহাপুরুষেরা সেইরূপ আত্মার জন্য দেহের আদর করেন। আত্মাই সংসারের মূল।

আমি। কতক বুঝিলাম। কিন্তু আত্মা দেহ হইতে নির্গত হইলে আত্মা ও দেহধারীর কষ্ট এক কি না?

ললিত। অবশ্য এক। দেহের সহিত আত্মা জড়িত থাকাতে প্রত্যেক দেহধারীর ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা লইয়া আত্মা

অন্তর্দ্ধান হয়। সেই এক এক আকাঙ্খার জন্য এক এক বার জন্ম এক এক বার মরণ। আকাঙ্খা নিঃশেষ হইলে ব্রহ্মে লীন ও নির্ব্বাণ প্রাপ্তি।

ললিতের কথা শেষ হইলে, আমি ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্ত আত্মার অবিনশ্বরত্ব বিষয়ক মধুর শ্লোক কয়েকটী মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলাম——

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথায় শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদযন্ত্যাপো ন শোষযতি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽযমদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্যএবচ
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।"

ললিত আমাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া বলিল "ভগবান করুন, তোমার সহিত যেন অনন্ত পুণ্যধামে সাক্ষাৎলাভ করিয়া সুখী হই।" তখন অকস্মাৎ জ্ঞানালোক নিবিয়া গেল। আমি অন্যমনস্ক হইয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, একধ্যানে ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময়ে অবিরত সেইস্থান কাঁপিতে আরম্ভ করিল। এমন ভয়ানক কম্প জন্মে দেখি নাই। মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। জাগিলাম, জাগিয়াও বোধ হইল যেন কাঁপিতেছি। রাত্রি তখন প্রভাত প্রায়, পাখীরা কলরব করিতেছিল, বাতায়নপথে অল্প অল্প আলোক মিটিমিটি হাসিতেছিল। আলো অন্ধকারে মেশামেশি করিয়া এক অপূর্ব্বভাব ধারণ করিয়াছিল।

আমার তখনও বোধ হইল যেন পৃথ্বী এক বিস্তৃত প্রেতপুরী।

এখন অন্ধকার আলোকে ডুবিয়া পড়িল, দুঃখ সংশয় হইতে আরম্ভ করিল। তখন আর সঙ্কীর্ণ কুলায়ে নিশ্চল থাকা যায় না, মধুরের কিচ কিচ শব্দে শব্দ না করিয়া থাকা যায় না, তখন আর মনের ভিতর রাখা যায় না, চক্ষে আসিয়া ফুটিয়া পড়িল।

আমি দেখিলাম আনন্দময়ী পৃথিবী। আনন্দময়ী পৃথিবীর আনন্দ কলরবে কেবল আমিই নিরানন্দ। মৃত নলিনকে মনে করিতেছিলাম, তাহার মলিন মুখ আর কি দেখা হইবে ভাবিয়া কাঁদিতেছিলাম। একবার ভাবিতেছিলাম পৃথিবীর এই সুন্দর শোভায় আমার সুখ কি? প্রিয়বন্ধুকে প্রেতপুরীতে পাইলেই বা সুখ কি?

আবার ভাবিতেছিলাম প্রেতপুরীতে এত অন্ধকার কেন? পৃথিবীতেই বা এত মধুররূপ কেন? আমার কথায় কেহ উত্তর করিল না। তখন আম্রশাখার প্রিয়সখার দিকে চাহিলাম। সে ডাকিল "কু"। আমি বলিলাম "প্রাণের কোকিল, তুমি না হইলে আর এমন প্রাণের কথা কার? ডাক, প্রাণের সখা, প্রাণ ভরিয়া ডাক তখন কোকিল আবার ডাকিল "কু"। আমি বুঝিলাম কোকিল কুস্বরে গাহিতেছে

"মমতা মায়াতে, জগতের লীলা,
খেলিছে আপনা আপনি।
মমতা মায়াতে, সকলই সুন্দর,
পশু পক্ষী নর অবনী॥

জীবের জীবন, এ প্রেম বন্ধন,
যদি না থাকিত জগতে।
বিধু দিবাকর, সকলই আঁধার,
হইত আমার মরতে।"

(দশ মহাবিদ্যা)